গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৭ সংখ্যা ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

নিউইয়র্কের গণআদালতের রায়

বুশ যুদ্ধাপরাধী

ইরাকে বর্বর হানাদারির অপরাধে অভিযুক্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও তার সহচরদের যুদ্ধাপরাধের বিচার করতে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (গণআদালত) গঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে জাপান, ফিলিপিনস্ জার্মানিতে শুনানির পর গত মে মাসে নিউ ইয়র্কেও শুনানির পর আবার নিউইয়র্ক শহরে মার্টিন লুথার কিং অডিটোরিয়ামে গত ২৬ আগস্ট বসানো হয়েছিল এরকম একটি ট্রাইব্যুনাল। সভা উপচে পড়েছিল মানুষের ভীড়ে। ছয় ঘণ্টা ধরে শুনানি চলাকালে বুশ এবং তার সাঙাতদের প্রতি গোটা হল সমবেত কণ্ঠে বলেছে — 'অপরাধী! অপরাধী!! অপরাধী!!!"

পৃথিবীতে যদি ন্যায়বিচার থাকত, তাহলে বুশ এবং তার দোসর ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে হাতকড়া পড়তো; তবে ট্রাইব্যুনালের দর্শক শ্রোতারা এই মুহূর্তে তা আশাও করেন না। কারণ তাঁরা জানেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার বিশ্বজোড়া অপরাধ, ইরাক ও আফগানিস্তান যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ, তা ধ্বংস করতে লাগাতার দীর্ঘ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এই ট্রাইব্যুনালের অন্যতম বিচারক ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টারের সারা ফ্লাউন্ডার্স বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, যেগুলি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আঘাতের লক্ষ্য — সেখানে এবং খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধ ও আগ্রাসন বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এই ট্রাইব্যুনাল কাজ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্ক, যিনি 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টার' (আই এ সি)-এর প্রতিষ্ঠাতা, বুশ এবং মার্কিন প্রশাসন ও

পাঁচের পাতায় দেখুন

ইরাকের তথাকথিত নির্বাচনে ভারতের অংশগ্রহণ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন আগ্রাসনকে আড়াল করার অপচেষ্টা

এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী গত ৩১ আগস্ট এক বিবৃতিতে, ইরাক ও আফগানিস্তানে তথাকথিত 'নির্বাচন' অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভারত সরকারের জড়িত হওয়ার সংবাদে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন আগ্রাসনকে আড়াল করার জন্যই এই লোকঠকানো 'নির্বাচন' এবং দুটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের উপর মার্কিন শাসকদের বেআইনি আধিপত্যকে 'আইনি' ছাপ দেবার এটি একটি কৌশলী প্রয়াস।

কমরেড মুখার্জী আরও বলেন, ভারতীয় জনগণের তীব্র প্রতিরোধের সামনে সরাসরি ভারত সরকার, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইচ্ছানুযায়ী ইরাকে ভারতীয় সৈন্য পাঠাতে ব্যর্থ হয়। সেজন্য এখন তারা নতুনভাবে চতুর উপায়ে চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে এই দুটি দেশে পুতুল সরকার কায়েম করার যে ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা চলছে তাতে ভারতকে অংশীদার করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের তুষ্ট করা যায়। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেই কমরেড নীহার মুখার্জী দাবি জানিয়েছেন যে, সিপিএম, সিপিআই সমর্থিত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘৃণ্য আঁতাত থেকে সরে আসতে হবে, অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার পথ কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই মার্কিন শাসকদের উল্লিখিত পরিকল্পনার সহযোগী হওয়া চলবে না।

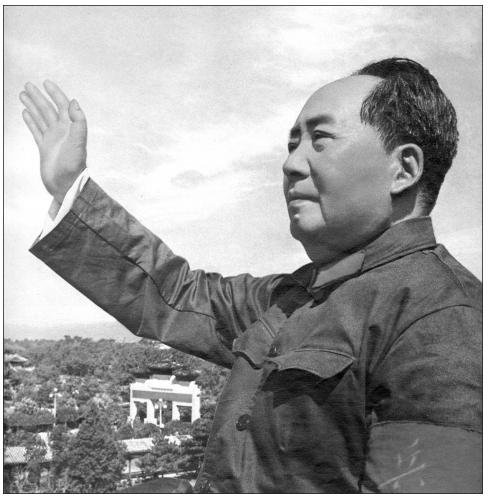

২৬ ডিসেম্বর ১৮৯৩ — ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

কেউ কেউ ভাবেন যে, আমাদের জনগণতন্ত্রে স্বাধীনতা যথেষ্ট কম এবং পশ্চিমী সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বাধীনতা অনেক বেশি। তাঁরা পশ্চিমী ধাঁচের দ্বিদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থা চান — যেখানে একটি দল সরকারি ক্ষমতায় এবং অন্য দল বিরোধী আসনে থাকে। কিন্তু এই তথাকথিত দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বুর্জোয়া একনায়কত্ব বজায় রাখার কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা কখনই শ্রমজীবী মানুষের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিমূর্ত নয়, তা বাস্তবে সুনির্দিষ্টরূপে অবস্থান করে। যে সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম চলছে, সেখানে যদি শোষকশ্রেণীর শ্রমিককে শোষণ করার স্বাধীনতা থাকে, তাহলে সেখানে শ্রমজীবীদের শোষিত না হওয়ার স্বাধীনতা থাকতে পারে না। যদি সেখানে বুর্জোয়াদের জন্য গণতন্ত্র থাকে তাহলে সর্বহারাশ্রেণী এবং অন্যান্য অংশের খেটেখাওয়া মানুষের জন্য কোন গণতন্ত্র থাকে না। কোন কোন পুঁজিবাদী দেশে কমিউনিস্ট পার্টির বৈধ অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয় বটে কিন্তু ততক্ষণই তা স্বীকার করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না বুর্জোয়াদের মূল স্বার্থকে তা বিপদগ্রস্ত করছে। এর চেয়ে বেশি এগোলে আর তাকে বরদাস্ত করা হয় না।

— মাও সে-তুং

(অন কারেক্ট হ্যান্ডলিং অব কন্ট্রাডিকশন অ্যামং দ্য পিপল, সিলেকটেড ওয়ার্কস, খণ্ড ৫)

৩১ আগস্ট শহীদ দিবসে জনসভা

ভাষণ দিচ্ছেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল। মঞ্চে (বাঁদিক থেকে) সভার সভাপতি কমরেড চিত্ত গোস্বামী (ওয়ার্কার্স পার্টি), কমরেড কালিকা মুখার্জী (এস ইউ সি আই), কমরেড প্রদীপ ব্যানার্জী (সি পি আই-এম এল)

সময় ঃ বেলা ৩টে ২০, স্থান ঃ রানি রাসমণি রোড, ১৪ বছর আগে ১৯৯০ সালের ঠিক এই ৩১ আগস্ট, এই সময় এই স্থানে পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন গণআন্দোলনের সৈনিক এস ইউ সি আই-এর কিশোর কর্মী কমরেড মাধাই হালদার। মূল্যবৃদ্ধি, ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের পুলিশের গুলিতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন তিনি। আন্দোলন দমন করতে আইন অমান্যকারীদের উপর নির্বিচার গুলিচালনায় সেদিন লুটিয়ে পড়েছিলেন আরও ৩১ জন এস ইউ সি আই কর্মী আহত রক্তাক্ত অবস্থায়। নিরস্ত্র গণআন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবীদের রক্তে সেদিন প্রকাশ্য রাজপথ হয়ে উঠেছিল লাল।

দিনটি ছিল ৩১ আগস্ট শহীদ দিবস। ১৯৫৯ সালের এই দিনটিতেই তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের পুলিশ খাদ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে কলকাতার রাজপথ থেকে কেড়ে নিয়েছিল ৮০টি তাজা প্রাণ। তাঁদেরই স্মরণে আজও বিভিন্ন বামপন্থী দলের উদ্যোগে প্রতিবছর এই দিনটি শহীদ দিবস হিসাবে পালন করা হয়। কিন্তু সেই খাদ্য আন্দোলন ও দীর্ঘ আরো নানান আন্দোলনের গৌরবকে কাজে লাগিয়ে আজ রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় যে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার আসীন, তাদেরই পুলিশের গুলিতে ১৯৯০ সালের ঐ দিনটিতেই কলকাতার রাজপথ আবার লাল হয়ে উঠেছিল গণআন্দোলনের কর্মীদের রক্তে।

সেই '৫৯ সালের খাদ্য

দুয়ের পাতায় দেখুন

মুর্শিদাবাদ

রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলনে নতুন অধ্যায়

দীর্ঘ প্রায় সাত মাস ধারাবাহিক আন্দোলনের পর ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর আহ্বানে মুর্শিদাবাদ জেলাশাসকের দপ্তরে ২৬ আগস্ট একদিনের ধর্মঘট পালিত হয়। গ্রেডেশন তালিকা প্রকাশ, প্রোমোশন, মৃত কর্মচারীর পোষ্যের চাকরি সহ মোট ছয় দফা দাবিতে ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল।

এই ধর্মঘট পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত করল। রাজ্য সরকারের কর্মচারী বঞ্চনার প্রতিবাদে এই সরকারের সুদীর্ঘ ২৭ বছরের রাজত্বকালে নোটিশ দিয়ে ধর্মঘট সম্ভবত এই প্রথম। অত্যন্ত সফল এই ধর্মঘটে মুর্শিদাবাদ জেলার রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, আগামী দিনে সামগ্রিকভাবে কর্মচারী আন্দোলনে তার প্রভাব পড়বে।

ধর্মঘট ভাঙতে একদিকে যেমন সরকার কমব্যাট ফোর্স সহ বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করেছিল অন্যদিকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং ফেডারেশন উভয়েই সামিল হয়েছিল। কেন্দ্রের কংগ্রেস এবং সিপিএমের জোট সরকারের প্রতিফলন ধর্মঘট ভাঙার ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ করলেন কর্মচারীরা। লাঠিচার্জ করে ধর্মঘটীদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ-প্রশাসনকে সুপারিশ করতেও দ্বিধা করেনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। শেষপর্যন্ত পুলিশবাহিনী নিয়ে মহিলা কর্মচারীদের পা-দিয়ে মাড়িয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) অফিসের তালা ভেঙে ঢোকেন। এই আকস্মিক ঘটনায় একজন মহিলা সহ দু'জন অসুস্থ কর্মচারীকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৬ জন মহিলা সহ ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ঐদিনই একজন কর্মচারী নূরসেলিম সেখকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ঐ দিন সন্ধ্যায় এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে পথসভা করে নিন্দা জানানো হয়। পরদিনই গোটা জেলা জুড়ে এই পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে কর্মচারীরা কালো ব্যাজ পরিধান করে ধিক্কার দিবস পালন করেন। এখনও প্রতিদিন বিক্ষোভ চলছে। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগামী দিনে আরও বড় ধরনের আন্দোলনের কথা ভাবছেন কর্মচারীরা।

হরিহরপাড়ায় মহিলাদের থানা অবরোধ

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে গত ২০ আগস্ট হরিহরপাড়া থানার সামনে মা-বোনেদের অবস্থান বিক্ষোভ হয়। বধূহত্যা, ইভটিজিং, ধর্ষণসহ সকল প্রকার নারী নির্যাতন, মদ-জুয়া-বেআইনি গাঁজা চাষ, অশ্লীল সিনেমা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে এবং শাসকদল-পুলিশ-সমাজবিরোধীদের যৌথ সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সহস্রাধিক মহিলা এই অবস্থানে অংশগ্রহণ করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা কমরেড পূর্ণিমা কর্মকার বলেন, হরিহরপাড়া থানা এলাকায় অসংখ্য নারী নির্যাতনের ঘটনার কোন প্রতিকার হয়নি। উল্টে পুলিশ ও সমাজবিরোধী চক্র অভিযোগকারীদের উপর সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। তাদের প্রশ্রয়ে দুষ্কৃতীরা অবাধে ঘুরে বেড়ায়। এমনকী প্রতিকারপ্রার্থী মহিলাদের পুলিশ কুপ্রস্তাব দেয়। অন্যতম জেলা সংগঠক কমরেড গীতা ভট্টাচার্য বলেন, নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশ চরম উদাসীন, কিন্তু মহিলাদের অধিকার রক্ষার আন্দোলন দমনে তারা নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা কমরেড অনুরাধা মণ্ডল ১৯৯২ সালে হরিহরপাড়ায় ঐতিহাসিক আন্দোলনে সপ্তশহীদের আত্মত্যাগের উল্লেখ করে বলেন, আজ আবার সেই নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে আন্দোলন করতে হচ্ছে। যুব সম্প্রদায়কে সমাজ-বিরোধীতে পরিণত করার শাসকদল ও পুলিশের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তিনি যুবসমাজের প্রতি আবেদন জানান। বিশিষ্ট আইনজীবী মৃণালকান্তি ব্যানার্জী জানান, মহিলাদের আইনগত কিছু অধিকার আছে। কিন্তু পুলিশ সেগুলি বহুক্ষেত্রেই কার্যকর করে না। বিচারব্যবস্থাও অনেক সময় পক্ষপাতিত্ব করে। এম এস এস-এর জেলা সভানেত্রী কমরেড প্রতিমা সিরাজ বলেন, পুলিশের কাছে সাধারণ মানুষের আবেদনের কোন মূল্য নেই। এমনকী হরিহরপাড়া থানার পুলিশ অফিসাররা সাধারণ ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত রক্ষা করে না। এস ইউ সি আই-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মদন সরকার বলেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হরিহরপাড়া থানাকে 'মডেল থানা' হিসাবে পুরস্কৃত করেছেন। অথচ এই থানা ঘুষের বিনিময়ে মদ-জুয়ার আসর বসায়, নির্যাতিতা নারীর ডায়েরি নেয় না। শাসক দলগুলি এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে না, বরং তারা বখরা পেতে ব্যস্ত। এম এস এস-এর এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে তিনি অভিনন্দন জানান। মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড় বলেন, আমাদের দেশে পুলিশ-প্রশাসন-আইনব্যবস্থা শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত। ফলে তাদের কাছ থেকে গরিব মানুষ তথা নারী সম্প্রদায়ের সুবিচার পাওয়ার আশা নেই। আন্দোলনের চাপেই আমাদের দাবি আদায় করতে হবে। তাই হরিহরপাড়ার মতই সারা দেশে মা-বোনেরা এম এস এস-এর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। তিনি জানান, সারা দেশে যেভাবে নারী নির্যাতন বাড়ছে, তা বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাতে আগামী নভেম্বর মাসে এম এস এস-এর উদ্যোগে সারা দেশ থেকে মহিলারা দিল্লিতে সমবেত হবেন। 'রাতেও পুলিশ মহিলাদের গ্রেপ্তার করতে পারবে এবং মহিলাদের গ্রেপ্তারের জন্য মহিলা পুলিশের দরকার নেই' বলে সুপ্রিম কোর্ট যে অগণতান্ত্রিক রায় দিয়েছে তারও প্রতিবাদ জানাবেন মহিলারা। পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতন রোধ করার দাবিতে আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে কলকাতায় ২৯ সেপ্টেম্বরের মহামিছিলেও এম এস এস যোগ দেবে একথা ঘোষণা করে তার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার কর্মীদের তিনি আহ্বান জানান।

উত্তর ২৪ পরগণা

বসিরহাটে পোল্‌ট্রি ফার্মারদের আন্দোলন

বসিরহাট পোল্‌ট্রি ফার্মাররা আন্দোলনে নামলেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের লাগাতার আক্রমণের পাশাপাশি পুরসভা যেভাবে করের বোঝা চাপিয়েছে তাতে গভীর সমস্যায় পড়েছেন বসিরহাটের পোল্‌ট্রি ফার্মাররা। সম্প্রতি বসিরহাটের পুর এলাকায় সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ডের মূল্যায়ন অনুসারে পুরসভা বাড়ি ঘরের ওপর উচ্চহারে কর চাপিয়েছে। পোল্‌ট্রি ফার্মারদের ওপর এই কর মারাত্মক হারে বাড়ানো হয়েছে। বসতবাড়ির সঙ্গে পোল্‌ট্রিকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখিয়ে উচ্চহারে কর চাপানোয় সমস্যায় পড়েছেন পোল্‌ট্রি চাষীরা। বাধ্য হয়েই তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন। 'পোল্‌ট্রি ফার্মার বাঁচাও কমিটি' গঠন করে ২ সেপ্টেম্বর প্রায় ৫০০ পোল্‌ট্রি ফার্মার বসিরহাট পুরসভা অভিযান করেন। সংগঠনের সভাপতি দেবপ্রসাদ ঘোষ, সম্পাদক প্রাণতোষ নন্দীর অভিযোগ, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে পোল্‌ট্রিতে মুরগী চাষ এখন অলাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন উপায় না পেয়ে বাঁচার তাগিদে বহু বেকার যুবক বাড়িতে ছোট পোল্‌ট্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। বহু শিক্ষিত যুবক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড জমা দিয়ে, অর্থাৎ চাকুরির দাবি পরিত্যাগ করে ব্যাঙ্কঋণ নিয়ে এই ব্যবসায় এসেছেন। নানা কারণে ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে অধিকাংশ ফার্মারকে। বহু ফার্ম বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, অথচ পুরসভা বসতবাড়ির সঙ্গে পোল্‌ট্রিকে এক করে বাণিজ্যিকভাবে উচ্চহারে কর চাপিয়েছে — যা মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'য়ের সামিল। এরই প্রতিবাদে ফার্মাররা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। পুরপ্রধান তাঁদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে সমস্যার কথা বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন এবং আপাতত কর আদায় স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছেন। পোল্‌ট্রি ফার্মার বাঁচাও কমিটির শ্রী অমিয় বাইন বলেন, শুধু পুরসভার আশ্বাসে সন্তুষ্ট থাকলে ভবিষ্যৎ আক্রমণকে রোখা যাবে না। সেজন্য সংগঠন শক্তিশালী করে আন্দোলনকে চালিয়ে যেতে হবে।

মেদিনীপুর

মেদিনীপুরে বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন চলছে

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ১ সেপ্টেম্বর থেকে বাসভাড়া বাড়ানো হয়েছে। এই অন্যায় অযৌক্তিক এবং অস্বাভাবিক বাসভাড়া বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এস ইউ সি আই মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড মানব বেরা।

তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, ২৮ বছরে তেলের দাম যতগুণ বেড়েছে, এরাজ্যে বাসের ভাড়া বাড়ানো হয়েছে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। দু'বছর আগে বাসভাড়া বাড়ানোর সময় রাজ্য সরকার ৯ শতাংশ অতিরিক্ত ভাড়া বাড়িয়েছিল যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের নাম করে, গত বছর রাস্তা উন্নয়নের নাম করে তেলের উপর লিটার প্রতি ১ টাকা সেস বসিয়েছে। অথচ যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য তো বাড়েইনি, রাস্তারও উন্নতি হওয়ার চেয়ে অবনতি হয়েছে বেশি। বাস দুর্ঘটনা ভয়াবহভাবে বাড়ছে। যাত্রী হয়রানিও বাড়ছে। মেদিনীপুর জেলায় প্রথম স্টেজ ৫ কিমি ছিল তা কমিয়ে ৪ কিমি করা হয়েছে। এই বিপুল ভাড়াবৃদ্ধি জেলাবাসী মেনে নেবেন না, প্রতিরোধ আন্দোলন হবে। স্টপেজে স্টপেজে যাত্রী কমিটি গড়ে তুলে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে জেলাবাসীর কাছে কমরেড বেরা আবেদন জানান।

৩১ আগস্ট দলের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক ও আর টি ও'র কাছে ডেপুটেশন দিয়ে এই বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারের দাবি জানান হয়েছে।

দুই মেদিনীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাস স্টপেজে এস ইউ সি আই এবং বাসযাত্রী কমিটি পথসভা করে বাড়তি ভাড়া বয়কটের জন্য যাত্রীদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। ৭ সেপ্টেম্বর দুই জেলায় এক ঘণ্টা প্রতীকী বাস অবরোধের ডাক দিয়েছে দলের জেলা কমিটি।

৩১ আগস্ট শহীদ দিবসে জনসভা

একের পাতার পর

আন্দোলনের শহীদদের ও শহীদ মাধাই হালদারের স্মরণে গত ৩১ আগস্ট সকালে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের শহীদবেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড কালিকা মুখার্জী; পার্টির অন্যান্য গণসংগঠনের পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়। এস ইউ সি আই-এর কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে ঐ দিন বিকালে রানি রাসমণি রোডে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ।

ঠিক বেলা ৩টে ২০তে শহীদ মাধাই হালদারের শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। প্রবল দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে শৃঙ্খলা ও বক্তব্য শোনার জন্য প্রবল আগ্রহ ছিল দেখবার মত।

ওয়ার্কার্স পার্টির কমরেড চিত্ত গোস্বামীর সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল বলেন যে, গণআন্দোলনই বর্তমানে মানুষের বিবিধ সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ। আজ সাম্প্রদায়িকতা যে ভয়াল রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে তাও রোধ করা সম্ভব একমাত্র সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবিতে তীব্র গণআন্দোলন ও তার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই। নীতি ও আদর্শভিত্তিক গণআন্দোলনে অংশগ্রহণই একমাত্র মানুষকে আজ উন্নত চরিত্র দিতে পারে, মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখাতে পারে।

কিন্তু আজ এই গণআন্দোলনকেই নানাভাবে মেরে ফেলার চক্রান্ত চলছে। চারিদিকে রব তোলা হচ্ছে — বন্‌ধ কর্মনাশা, মিছিল-মিটিং স্বাভাবিক জনজীবনের পরিপন্থী। তাই এইসব চলবে না, এগুলির ওপর নানারকম আইনি নিয়ন্ত্রণ আরোপ জরুরি। এমনকি সিপিএম নিয়ন্ত্রিত বামফ্রন্টও আজ এই মতেরই শরিক। তাঁরাও আজ নিয়ন্ত্রিত মিছিল-মিটিং-এর পক্ষে সওয়াল করছেন। এসবই আসলে গণআন্দোলনকে আইনি বেড়াজালে বেঁধে ফেলে তাকে পঙ্গু করে ফেলার চক্রান্ত। এর লক্ষ্য মানুষের প্রতিবাদের কণ্ঠকে হত্যা করা, মনুষ্যত্বের বিনাশ ঘটানো ও সেই পথে ফ্যাসিবাদ কায়েম করা। এই আন্দোলনবিরোধী বাতাবরণ তৈরিতে বিচার বিভাগও এগিয়ে এসেছে। বন্‌ধ ও মিছিল-মিটিং বিরোধী সাম্প্রতিক রায়গুলি তারই নিদর্শন।

তিনি আরও বলেন, '৫৯ সালের শহীদরা প্রাণ দিয়েছিলেন গণআন্দোলনের দাবি আদায় করতে। যেসব বামপন্থী রাজনৈতিক দল সেদিন আন্দোলনের শরিক ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই আজ রাজ্যে বা কেন্দ্রে ক্ষমতায় বা ক্ষমতার কাছাকাছি রয়েছে। কিন্তু জনজীবনের সমস্যার সমাধান হয়নি। বরং শ্রমিক-চাষী ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে সমস্যা-সঙ্কট আরও তীব্র হয়েছে। কারণ এইসব বামপন্থী দলগুলি সরকারে বসে পুঁজিবাদকে আঘাত করার বদলে পুঁজিবাদের সেবা করছে। এইসব দলগুলি 'বামপন্থা' ও 'মার্কসবাদের' কথা আউড়ে শহীদদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকেই আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে। গণআন্দোলনকে সংগঠিত করে গণঅভ্যুত্থানে রূপ দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের মাধ্যমেই শহীদদের স্বপ্ন সফল করা সম্ভব, সম্ভব মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অর্জন।

সভায় অন্যান্য বামপন্থী দলের বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সিপিআই(এম-এল) লিবারেশনের পক্ষ থেকে কমরেড কার্তিক পাল, সিপিআই(এম-এল)-এর কমরেড প্রদীপ ব্যানার্জী, বলশেভিক পার্টির পক্ষ থেকে কমরেড চিত্ত নাথ ও পি আর পি আই-এর কমরেড সুনন্দ হীরা প্রমুখ।

মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ

নারীদের প্রতি অবমাননা ও চূড়ান্ত প্রতারণা

বেশ কিছুদিন থেকে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদানের (empowerment of the women) কথা বলে মহিলাদের জন্য বিধানসভা ও লোকসভায় ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের দাবি কোন কোন মহল থেকে, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন প্রায় সমস্ত পরিষদীয় দলগুলোর পক্ষ থেকে উত্থাপিত হচ্ছে। পত্র-পত্রিকায়ও এ নিয়ে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা ও চিন্তা-চর্চা চলছে। আপাতদৃষ্টিতে যেটা বিস্ময়কর, তা হচ্ছে, মুমূর্ষু খেটেখাওয়া মানুষ, যাঁরা দেশের জনসংখ্যার ৯০-৯৫ ভাগেরও বেশি, তাঁদের বাঁচার ন্যূনতম প্রয়োজন সম্পর্কে যাদের ভ্রুক্ষেপ নেই, সেই পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের স্বার্থে পরিচালিত কংগ্রেস-বিজেপি সহ তাদের বিশ্বস্ত সবকটি দল এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন সকলেই এই প্রশ্নে খুব সরব। আরও উল্লেখযোগ্য হল, এই প্রশ্নে এদের সাথে সিপিএম, সিপিআই ও তাদের সহযোগী দলগুলিও জোট বেঁধেছে। কেন্দ্রে সরকারি ক্ষমতায় থাকাকালীন বিরোধী পক্ষের কংগ্রেস, সিপিএম, সিপিআই প্রভৃতি দলের সমর্থন নিয়ে এই উদ্দেশ্যে লোকসভায় বিজেপি একটি বিল উত্থাপন করেছিল। কিন্তু সংরক্ষণ কত শতাংশ করা হবে এবং সংরক্ষিত আসনের মধ্যে আবার জাতপাত অনুযায়ী বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা কতটা হবে তা নিয়ে মতভেদ দেখা দেওয়ায় ঐ বিলটি তখন পাশ করা যায়নি। কিন্তু কংগ্রেস-বিজেপি সহ সিপিএম-সিপিআই প্রভৃতি দল বিলটি পাশ করাবার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। নতুন কংগ্রেস জোট সরকারও পুনরায় ঐ বিল পাশ করাবার ইচ্ছা ঘোষণা করেছে। খুব স্বাভাবিক কারণেই বহু মানুষের মধ্যে এবং মহিলাদের একটা বিরাট অংশের মধ্যে এ নিয়ে একটা আশা-আকাঙ্ক্ষাও দেখা দিয়েছে। পুঁজিবাদী শোষণে নির্যাতিত-নিপীড়িত-অবহেলিত এবং পিতৃতান্ত্রিক শোষণে পর্যুদস্ত মহিলাদের মধ্যে এমন ধারণাও সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এই বিল গৃহীত হলে তাঁদের সমস্যার বেশ কিছুটা প্রতিকার হবে। এই পরিস্থিতিতে প্রস্তাবিত লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের আসন সংরক্ষণের বিষয়টির সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

মহিলাদের সমস্যাগুলির শিকড়ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে

এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, মহিলাদের সমস্যা, যে সমাজে বা দেশে তাঁরা বাস করেন, সেই বিশেষ সমাজ বা দেশের সমস্যা থেকেই উদ্ভূত। তাই এর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এ সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ সম্ভবপর হবে না এবং তার সঠিক সমাধানও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভারতবর্ষে মহিলাদের সমস্যার চরিত্র বোঝার জন্য তাই ভারতবর্ষের বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে হবে। সকলেই অবগত আছেন, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে এবং তদনুযায়ী অনুকূল ও পরিপূরক সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থায় সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী পুঁজিপতিশ্রেণী। সর্বময় রাজনৈতিক কর্তৃত্বও তাদের হাতে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের ৯৫ ভাগ মানুষই তাই প্রকৃত অর্থে এই ব্যবস্থায় কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করেন না। লোকদেখানো কিছু অধিকার এবং মুখে গণতন্ত্র, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী আওড়ালেও এবং মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ভোটের উৎসব আয়োজন করলেও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের ৯৫ ভাগ মানুষের জীবনে প্রকৃত অর্থে এগুলোর কোন মূল্যই নেই। এমনকী তাদের সর্বস্বান্ত, হতদরিদ্র, দ্রুত নিম্নাভিমুখী জীবনের অবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রদত্ত সেই লোকদেখানো অধিকারগুলোর কোন কার্যকারিতাই নেই। দেশের মোট জনসংখ্যার ৯০-৯৫ ভাগ শোষিত মানুষের প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ বিপ্লবাত্মক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে উৎখাতের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই লোকদেখানো অন্তঃসারশূন্য 'অধিকারগুলো' দিয়ে এরা শোষিত জনসাধারণকে মোহাচ্ছন্ন করার চেষ্টা করছে। এই দিক থেকে বিচার করলে এগুলি কার্যত একদিকে পুঁজিপতিশ্রেণীর রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করছে, অপরদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষিত জনসাধারণ যে কোনরকম রাজনৈতিক অধিকারই ভোগ করেন না — এই সত্যকেই শোষিত জনসাধারণের কাছে প্রতারণার মধ্য দিয়ে আড়াল করছে। সেইজন্যই মহান মার্কসবাদী বিপ্লবী চিন্তানায়ক লেনিন পুঁজিপতিশ্রেণীর এই ভ্রষ্টাচার এবং কপট আচরণের মুখোশ খুলে দিয়ে বলেছেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গণতন্ত্র, অধিকার এইসব কথা শাসক পুঁজিপতিদের মুখে ঘন ঘন উচ্চারিত হলেও যে কথাটা অতি অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে, তাহল, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক এবং শোষিতের পরস্পর সংঘাতময় শ্রেণীস্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের ধারণাও এক হতে পারে না। শোষকের গণতন্ত্র ও অধিকার, আর শোষিতের গণতন্ত্র এবং অধিকার এক হতে পারে না। এই অর্থেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে গণতন্ত্র এবং অধিকারেরও শ্রেণীচরিত্র রয়েছে। এটা বোঝাতে গিয়েই লেনিন প্রশ্ন তুলেছেন, ''কোন্ শ্রেণীর জন্য গণতন্ত্র, কোন্ শ্রেণীর বিরুদ্ধে?'' ('Democracy for which class, against which class?') জোরের সঙ্গে তিনি বলেছেন, এই প্রশ্ন চাপা দিয়ে যারা সাধারণভাবে ''সকলের জন্য গণতন্ত্র, সকল জনগণের অধিকার'' এইভাবে বলে, হয় তারা নিতান্তই অজ্ঞ, নয়তো অতি অবশ্যই পুঁজিপতিশ্রেণীর ধূর্ত ও ধুরন্ধর তাঁবেদার, তাদের স্বার্থরক্ষাকারী এজেন্ট।

নারী হোন, পুরুষ হোন, বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে

এই যখন একটি পুঁজিবাদী দেশের বাস্তব অবস্থা তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, এই ব্যবস্থায় নিছক নির্বাচনে জয়লাভ করা বা নির্বাচিত হওয়ার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই যেহেতু প্রকৃত ক্ষমতাটা থাকে অন্যত্র। দ্বিতীয়ত, একথাও সত্য যে, এই ব্যবস্থায় সাধারণভাবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও শোষিত জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিরা সেই নির্বাচনে খুব অল্প সংখ্যাতেই নির্বাচিত হতে পারেন। পুঁজিপতিশ্রেণীর নানা কলাকৌশল, টাকাপয়সা, বুর্জোয়াশ্রেণীর একচেটিয়া আয়ত্তাধীন প্রচারযন্ত্রের ঢালাও প্রচার, সাধারণ মানুষের উপর জোর-জবরদস্তি-বলপ্রয়োগ-ভীতিপ্রদর্শন, জাতপাত সম্প্রদায়ের প্রশ্ন তুলে জনগণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা এবং প্রয়োজনে কোন রাখঢাক না রেখেই সমস্ত নির্বাচনী ফলাফলকে কারচুপির সাহায্যে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে যাওয়া — বর্তমান সময়ে আমাদের দেশ সহ প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই নির্বাচন এইভাবেই হচ্ছে। এইভাবেই পুঁজিপতিশ্রেণীর এই দল কিংবা সেই দল নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন হচ্ছে। এটা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট। কেবল ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেরই নির্বাচন সেই দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী অবিসংবাদিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। নির্বাচিত সদস্যদের অধিকাংশই কোন না কোন বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী অথবা কর্পোরেট সেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাদের বেঁধে দেওয়া গণ্ডীর বাইরে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা এই সব দলের তথাকথিত নির্বাচিত সদস্যদের নেই। এমতাবস্থায় পুঁজিপতিশ্রেণীর সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে যদি শোষিত জনসাধারণের প্রকৃত দু-একজন প্রতিনিধি, অর্থাৎ দেশের বিপ্লবী দলের দু-একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে জয়যুক্ত হনও, শোষিত জনসাধারণের শোষণের তীব্রতা কিছুটা পরিমাণেও উপশম ঘটাবার মত কোন কাজই এরা করতে সক্ষম নন। কারণ, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে সরকার গঠিত হয়, সেটা পুঁজিপতিশ্রেণীরই সরকার। তাছাড়া, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই এমন যে, এখানে পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণ কমে না বরং তা ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। এই অবস্থায় বিপ্লবী ভাবধারায় প্রকৃতই উদ্বুদ্ধ কতিপয় ব্যক্তি নির্বাচিত হলে একমাত্র যে কাজটি করতে পারেন, তা হল, জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত নিপীড়িত মানুষের নির্মম শোষণের স্বরূপ ও মর্মন্তুদ চিত্র সংসদের অভ্যন্তরে তুলে ধরতে পারেন, তাঁদের ন্যায্য দাবি উত্থাপন করতে পারেন, পুঁজিপতিশ্রেণীর নির্মম শোষণের প্রকৃত চরিত্র জনগণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন। অন্যদিকে, দেশের অভ্যন্তরে শোষিত জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন গড়ে উঠলে, তার কণ্ঠস্বর বিধানসভা ও লোকসভার অভ্যন্তরে পৌঁছে দিতে পারেন। এই কাজ বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যেকোন নির্বাচিত সদস্যই করতে পারেন। বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি পুরুষ হন তবে তাঁরা কেবল নির্যাতিত পুরুষদের সম্পর্কেই বলবেন, নির্যাতিতা মহিলাদের সম্পর্কে বলবেন না, অথবা নির্বাচিত বিপ্লবী সদস্যরা যদি মহিলা হন তবেই একমাত্র তাঁরা নির্যাতিতা মহিলাদের জন্য বলবেন এমন ধারণা যেমন অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক, তেমনই অকল্পনীয়। অপরদিকে, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী দলের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্যাতিতা মহিলাদের সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, উৎপীড়ন, নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে মুখ খুলবেন, এটা আশা করাও বাতুলতা।

এখানে আর একটি বিষয়ও বিচার করে দেখা দরকার। যুগ যুগ ধরে চলে আসা সংস্কারের প্রভাবে সমাজে নারীদের মানসিকতা, দু-একজন ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, আজও পুরুষনির্ভর হয়ে আছে। এ জিনিস এমনকী তথাকথিত শিক্ষিত নারীদের মধ্যেও আছে। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে গণতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তিতে সর্বব্যাপক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালিত হয়নি, সমাজের গণতন্ত্রীকরণ হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব আপোষকামী সংস্কারবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে থাকার ফলে তারা সমাজের গণতন্ত্রীকরণ করেনি। নারী স্বাধীনতার স্লোগান তুললেও নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়নি, তাদের প্রতি বৈষম্য দূর হয়নি। বরং পুঁজিবাদের সঙ্কট যত বেড়েছে সমস্যা যত তীব্র হয়েছে, বাস্তব অর্থে এই বৈষম্যও বেড়েছে। তাই শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়ে যদি এই প্রশ্নে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহলে এই কথাটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যতক্ষণ শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে থাকবে, যতক্ষণ পুঁজিপতিদের স্বার্থে, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরুষশাসিত সমাজ টিকে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিধানসভা-লোকসভা নির্বাচনে ৩৩ শতাংশ কেন, সমাজের জনসংখ্যার অর্ধেক যেহেতু মহিলারা, সেইহেতু যদি ৫০ শতাংশ আসনও মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয় তাহলেও মহিলাদের শোষণ-নির্যাতনের অবসান তো ঘটবেই না, এমনকী অবস্থার সামান্যতমও উন্নতি হবেনা। পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী কোন না কোন দলের নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা পুঁজিপতিশ্রেণীর আজ্ঞাবাহক নির্বাচিত পুরুষ সদস্যদের মত শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর আজ্ঞাবাহক হিসেবেই কাজ করবেন। তামাম পুঁজিবাদী দুনিয়ার সংসদীয় রাজনীতি থেকে এটাই প্রতিদিন প্রতিভাত হচ্ছে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অনুপস্থিতিতে মহিলাদের 'এমপাওয়ারমেন্ট' অন্তঃসারশূন্য স্লোগান ছাড়া কিছু নয়

দ্বিতীয় বিবেচ্য দিকটি হচ্ছে, পুঁজিবাদ শাসিত ভারতবর্ষে মহিলাদের অগ্রগতির সামনে প্রধান বাধা এবং যথার্থভাবে বলতে গেলে তাদের জীবনের সমস্ত জ্বলন্ত সমস্যাগুলির পেছনে মূল যে কারণটি কাজ করছে তা হল, তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তাঁদের স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের সামান্যতম সুযোগের অনুপস্থিতি। অর্থাৎ, পুঁজিবাদী শোষণ এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত পুরুষপ্রধান সমাজের কর্তৃত্ব ও নির্মম শোষণ থেকে নারীসমাজের মুক্তির জন্য নারীমুক্তির যে আহ্বান বিশ্বের সর্বত্র আজ দ্রুত গড়ে উঠছে তার চাবিকাঠিটি নিহিত রয়েছে মূলত তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার ওপরেই, যদিও একথা ঠিক যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দ্বারাই প্রকৃত নারীমুক্তি অর্জিত হতে পারেনা। এর সাথে নারীমুক্তির পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলনও যথোপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে পরিচালনা করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতাটাই হচ্ছে অন্যান্য সমস্ত স্বাধীনতা এবং অধিকারের নিয়ন্ত্রক। এর অনুপস্থিতিতে কোন অধিকারই বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অধিকারগুলো, তা লিখিত বা মৌখিক যাই হোক, সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য হতে বাধ্য এবং বাস্তবেও তাই। অথচ এটা স্পষ্ট যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আজ আর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনও সম্ভবপর নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণামে, অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য শিল্পবিকাশের কোন সুযোগই আজ আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নেই। এই ব্যবস্থায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়া দূরে থাকুক, কর্মসংস্থানের বর্তমান ক্ষেত্রও দ্রুত সংকুচিত হচ্ছে। এটা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির অমোঘ নিয়মেই এটা হচ্ছে। ফলে পুরুষ সহ জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজের কাছেও কর্মসংস্থানের প্রায় কোন সুযোগই আজ আর খোলা নেই। অন্যদিকে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান দূরে থাকুক, এই অতীব জরুরি প্রয়োজন অন্তত কিছুটা পূরণ করার জন্যও কোন প্রচেষ্টা সরকারি মহল থেকে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বিপরীতে সংস্কারের ধাক্কায় চাকরির সুযোগ ক্রমেই কমছে।

অন্যদিকে দেশের সর্বত্র নারী নির্যাতনের ঘটনা যে মারাত্মক গতিতে বাড়ছে, কঠোরভাবে সেগুলি দমন করারও কোনও চেষ্টা হচ্ছে না। সংরক্ষণের

চারের পাতায় দেখুন

নারীদের প্রতি অবমাননা ও চূড়ান্ত প্রতারণা

তিনের পাতার পর

দাবিতে সোচ্চার যে রাজনৈতিক দলগুলি, তারা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার পরিচালনা করলেও — এই প্রশ্নে সকলেই নির্বাক দর্শক। নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দূরে থাকুক, উপযুক্ত আইন প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইনগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করার কোন চেষ্টাই এরা করছে না। বরং উল্টোদিক থেকে দেখা যাচ্ছে, নারীকে কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়ার মানসিকতা, সমকাজে পুরুষের সাথে সমান মজুরি না দেওয়া, নারীকে পুরুষের ভোগ্যবস্তু হিসাবে গণ্য করা, বিজ্ঞাপনে নগ্ন নারীদেহের প্রচার ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই সমস্ত দলের নেতা-কর্মী এবং তাদের পরিচালিত সরকারের পুলিশ-প্রশাসনও এই ব্যাপারে একই দোষে দুষ্ট। অথচ এরাই আজ নারী সমাজের প্রতি দরদে উথলে উঠেছেন, মহিলাদের আসন সংরক্ষণের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। এটা পরিহাস ছাড়া আর কি হতে পারে? কিন্তু শুধু পরিহাস বলেই থামা যাবে না। এর মধ্য দিয়ে নারী সমাজের মধ্যে তাদের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির প্রতিকারের জন্য যে সচেতনতা দ্রুত গড়ে উঠছে এবং একটা আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে — তাকে বিপথগামী করার এবং এটাকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার দুরভিসন্ধিও তাদের এসব আচরণের মধ্যে ফুটে উঠছে।

এই প্রেক্ষাপটে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নারীরা যদি বহু সংখ্যায়ও লোকসভা-বিধানসভায় নির্বাচিত হন, তাতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের দুর্দশা, তাদের জীবন ও জীবিকার উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ বন্ধ হবে না। নারীদের মর্যাদার পক্ষে চরম অবমাননাকর হলেও নগ্ন নারীদেহের অশ্লীল প্রদর্শনী যাকে এখন পুঁজিবাদী বাজারের পণ্যে পরিণত করা হয়েছে, তাও অপ্রতিহতভাবে চলতে থাকবে। নারীপুরুষ নির্বিশেষে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই একমাত্র পারে এভাবে কায়েমী স্বার্থবাজদের দ্বারা নারীদেহের বাণিজ্যিক ব্যবহারকে বন্ধ করতে।

তাছাড়া, মহিলাদের ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের যে কথা বলা হচ্ছে, সেই বিষয়টি বিচারের সময়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের পরিণতি আমাদের দেশে কি হয়েছে তাও দেখা দরকার। সকলেই জানেন, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তপশিলি জাতি ও উপজাতি অংশের মানুষের চাকরির প্রশ্নে প্রথমে ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণের সুযোগ সীমিত করা ছিল। কিন্তু আজ ৫০ বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেলেও সেই সমস্যার সমাধান হয়নি। ফলে এই সময়সীমা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে শুধু নয়, ক্রমে এস-সি/এস-টির সাথে যুক্ত করা হয়েছে অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া জাতিগুলির (other backward castes বা OBC) পর্যায়ভুক্ত মানুষদেরও। এত বছরের অভিজ্ঞতায় একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, পিছিয়ে-পড়া মানুষদের কথা তুলে সংরক্ষণের নামে যদি কিছু সুযোগ কেউ পেয়ে থাকে, সেটা হল সেই অংশের মানুষদের মধ্যে যারা সম্পদের অধিকারী কেবলমাত্র তারা। আজকাল এদের সুবিধাভোগী শ্রেণী (creamy layer) বলা হয়। মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ নেই।

মহিলারা কোন ক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে নিম্নমানের নয়

সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হল যে, একদিকে চাকুরির সুযোগ যেমন ক্রমাগত সঙ্কুচিত হচ্ছে, অপরদিকে তার সাথে পাল্লা দিয়ে সংরক্ষণের শতাংশও বাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরেও — যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যর্থ হতে বাধ্য — এখন তোলা হচ্ছে মহিলাদের সংরক্ষণের দাবি, বিধানসভা এবং লোকসভায় আসনের প্রশ্নে। একথা সকলেই জানেন যে, মহিলারা কোন দিক থেকেই পুরুষদের থেকে পিছিয়ে-পড়া নয়, জন্মগত দিক থেকেও নয়। অথচ তাদের বলা হচ্ছে, সমাজের দুর্বলতর অংশ। জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, মহিলারা কি সত্যিই দুর্বল? তাছাড়া মহিলাদের দুর্বল মনে করা চূড়ান্ত অবমাননাকর ছাড়া কিছুই নয়। আজকে এটা প্রমাণিত যে, মহিলারা সুযোগ পেলে সমস্ত ক্ষেত্রে পুরুষের মতই বিকাশলাভ করতে পারেন।

ইস্যুটিকে আর একদিক থেকেও বিচার করা উচিত। এতদিন লোকসভা ও বিধানসভার এমনকী ১০০ শতাংশ আসনেই নির্বাচিত হওয়ার অধিকার পুরুষরা ভোগ করেছেন, যদিও এই একই অধিকার ভোগ করার প্রশ্নে নারীদের ক্ষেত্রেও কোন আইনি বাধা ছিল না। এই অবস্থায় মহিলাদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষিত করে দিলে তার দ্বারা আরও বেশি সংখ্যায় মহিলাদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাই কি মার খায় না? ধরে নেওয়া যাক যে, বহুদূর পর্যন্ত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সুনিশ্চিত করতে পারার মতো একটা পরিস্থিতি জনগণ সৃষ্টি করতে পারলেন। তেমন অবস্থায় সকল পুরুষ প্রার্থীই তাদের চরিত্র, যোগ্যতা ও জনগণের আন্তরিক ও পূর্ণ সমর্থনের ভিত্তিতে, কোনও 'সংরক্ষণ আইন'-এর দ্বারা সংরক্ষিত না হয়েই নারী-পুরুষ সকল ভোটদাতার ভোট পেয়েই শুধু কতিপয় আসনে নয়, সবকটি আসনেই যেমন জয়ী হতে পারেন, তেমনি ভবিষ্যতে এমন সময়ও কি আসতে পারে না যখন একই বিচারধারার ভিত্তিতে ভোটাররা উত্তরোত্তর বেশি সংখ্যায় নারী প্রার্থীদের নির্বাচিত করবেন? আজই হয়তো তা আমরা ঘটতে দেখছি না, তাই বলে ভবিষ্যতেও এমন সম্ভাবনাকে কি বাতিল করা যায়? বিশেষত আজও মহিলা প্রার্থীরা যেভাবে পুরুষ ও মহিলা উভয় ভোটারদের সমর্থন পেয়েই নির্বাচনে জয়লাভ করছেন, এবং এমনকী সরকার ও রাষ্ট্রের উচ্চতম পদেও আসীন হচ্ছেন, তাতে ভবিষ্যতে সকল আসনেই মহিলা প্রার্থীদের জয়ের সম্ভাবনা কি পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায়? এই অবস্থায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা একতরফাভাবে সীমিত করে দেওয়া হলে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার দ্বারা উপরোক্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে বাধা দেওয়া হবে না কি ? এই সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীরভাবে বিশ্বাস করলেও আমরা বিপ্লবীরা জানি, যাঁরা ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের কথা বলছেন, আমাদের এই কথা শুনে তাঁরা ক্ষিপ্ত হবেন, তাঁদের গোপন মতলবটা ফাঁস হয়ে যাওয়ার জন্য।

এই প্রসঙ্গে এ প্রশ্নও ওঠা উচিত, কেন নির্বাচনে নারীদের ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের মধ্যে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে? মুখে নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলে এইভাবে নারীদের প্রলোভিত করে আসলে নারীদের অসম করার, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে অবনমিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে কেন— এ প্রশ্ন গভীরভাবে ভাবা দরকার?

আসন সংরক্ষণের প্রবক্তারা নিজেরা কী ৩৩ শতাংশ আসনে মহিলাদের মনোনয়ন দিচ্ছেন?

আইন পাশ হোক কিংবা না হোক, যাঁরা নির্বাচনে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা বলছেন, যখন বিধানসভা এবং লোকসভায় তাঁরা প্রার্থী মনোনয়ন করছেন তখন সে অনুপাতে মহিলা প্রার্থী তাঁরা মনোনীত করছেন না কেন? যাঁরা লোকসভায় এই বিল আনার জন্য হইচই করছেন, তাঁরা যদি সকলেই সেইভাবে মহিলা প্রার্থী নির্বাচন করেন তাহলে তো ঐ অনুপাতে মহিলারাও নির্বাচিত হবেন — এটা নিশ্চিত বলা যায়। কারণ নির্বাচন তো বুর্জোয়াশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় ঐসব দলেরই কেউ না কেউ নির্বাচিত হন। কিন্তু সকলেই লক্ষ করছেন, তাঁরা সে পথে হাঁটছেন না। এর মধ্য দিয়েই এদের আসল মতলব ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। আসলে এঁরা বিল পাশ করানোর জন্য আদৌ ততটা আন্তরিক নন। ভোটের বাজারে ফায়দা ওঠাবার জন্য এই সমস্ত ভোটবাজ দল যাতে একে অপরের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের প্রতারণামূলক মানসিকতা গোপন করতে পারে তার চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রতারণামূলক স্লোগান তুলে দেশের মধ্যে দ্রুত যে নারীমুক্তি আন্দোলন গড়ে উঠছে তাকে বিপথগামী করা এবং তাকে বাধা দেওয়াটাই হচ্ছে এদের আসল উদ্দেশ্য।

এই প্রসঙ্গে নারী সমাজকে যে গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে বিবেচনায় নিতে হবে তা হল, পুরুষশাসিত সমাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নারীমুক্তির অতীব জরুরি দাবিটি যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে, সেইহেতু এই আন্দোলন সার্থক করে তুলতে পুরুষ সম্প্রদায়ের শোষিত জনগণের সাথে কোন অবস্থাতেই বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বে তাদের জড়িত হওয়া চলে না। এমনভাবে তাদের কাজ করতে হবে যাতে একই সাথে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে গিয়ে পুরুষ সম্প্রদায়ের সাথে তাদের গভীরতর ঐক্য ও মৈত্রী গড়ে তোলা যায়। বলা বাহুল্য, নারীরা পুরুষশাসিত সমাজে নিপীড়িত হলেও এই বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, বিশেষভাবে কোন পুরুষকে এর জন্য দায়ী করা চলে না। কারণ এটি একটি নৈর্ব্যক্তিক ব্যবস্থা (impersonal system) থেকে জন্মলাভ করেছে। বিপ্লবের ভয়ে ভীত শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক ভাগ নারীদেরও যত প্রকারে সম্ভব ঐক্য থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে এবং বিভেদ বাড়াতে চাইছে। তাদের যত প্রকারে সম্ভব অনগ্রসর রেখে, তাদের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাস, আদিম কুসংস্কার জিইয়ে রাখার জন্য ফেলে আসা ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনবাদী চর্চা করছে এবং পুরুষদের মধ্যে ধূর্ততার সাথে নারী বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তাদের সমর্থনেই এই জঘন্য কাজ করছে। এই পরিস্থিতিতে নারী মুক্তি আন্দোলনের অতীব জরুরি পূর্বশর্ত হিসাবেই পুরুষ সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের জন্য নারীদের সচেতন হতে হবে, জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির প্রতিকারের জন্য গড়ে ওঠা আন্দোলনে সামিল হয়ে পুরুষদের সঙ্গে তাদের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন অংশের শোষিত জনসাধারণকে যেমন নিজেদের ঐক্যে ফাটল ধরতে পারে এমন সকল কাজ পরিহার করতে হবে, তেমনি এক্ষেত্রেও নারী সমাজকে পুরুষের সঙ্গে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন সকল কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। বলা বাহুল্য মহিলা আসন সংরক্ষণের যে প্রস্তাবটি বুর্জোয়া পেটিবুর্জোয়া দলগুলি নিয়ে এসেছে তাতে এই ঐক্য গড়ে তোলার কাজ খুবই বিঘ্নিত হবে এবং বুর্জোয়া দলগুলি এতে মদত যোগাবে। তাই সংগ্রামী নারী সমাজকে অতি অবশ্যই এই সর্বনাশা দিকটি উপলব্ধি করতে হবে এবং যেকোনভাবে এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি জরুরি বিষয় বিচার-বিবেচনা করতে হবে। সেটি হল, নারী পুরুষ নিয়ে গঠিত যে কোন অবিভক্ত অবিভাজ্য জনসমাজে যে কোন সংরক্ষণই চরিত্রের দিক থেকে অতি অবশ্যই একটা বিভাজনের জন্ম দেয়। খুব জরুরি প্রয়োজন দেখা না দিলে তাই এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা, শোষিত জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থের দিক থেকে আদৌ কাম্য নয়। সকলেই অবগত আছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন যখন এদেশে দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করছিল, তাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা সেদিন দেশের মানুষকে হিন্দু-মুসলিমে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে আলাদা নির্বাচকমন্ডলী (separate electorate), বা দুই সম্প্রদায়ের জন্য দুই নির্বাচকমণ্ডলীর জন্ম দিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বৃটিশের এই চক্রান্তকে সেদিন ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, দেশে জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। স্বাধীনতার আগে নিম্নবর্ণের হিন্দুধর্মাবলম্বী দরিদ্র মানুষদের উপর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের শোষণ এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা দুরূহ হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের-ভয়ে-ভীত জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী যারা জাতীয় কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিল তারা এই উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করার কোন চেষ্টাই করেনি। উল্টে এদের মধ্যে বিভেদের বীজ জিইয়ে রাখতে চেয়েছে। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, স্বাধীনোত্তর ভারতে বর্ণবিদ্বেষের এই পরিবেশ এবং দলিত সম্প্রদায়ের অতীব অনগ্রসর অবস্থা বিবেচনা করে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতি মানুষের জন্য নির্বাচন ও চাকরিবাকরির ক্ষেত্রে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সকল জনগণের ঐক্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী বিবেকবান মানুষরা, এর ক্ষতিকর দিকটি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন; তা সত্ত্বেও তৎকালীন অবস্থার বিবেচনায় স্বল্পকালীন পদক্ষেপ হিসাবে তাকে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন, যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে দলিত জনসাধারণের বেশ কিছুটা উন্নতি ঘটিয়ে এই ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হবে। যাঁরা এই সংরক্ষণের প্রবক্তা ছিলেন তাঁরাও এই বিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে দলিত জনসাধারণের সর্বাত্মক বিকাশের স্বার্থে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপ দেওয়া ঠিক হবে না। সকল জনগণকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে পায়ে পা মিলিয়ে সংগ্রাম করে উন্নততর অবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সংরক্ষণ স্থায়ী রূপ পেলে এই প্রক্রিয়া নিশ্চিতরূপে ব্যাহত হবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে লক্ষ করা গিয়েছে, বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলি যারা একের পর এক শাসনক্ষমতায় বসেছে, তারা তাদের ভোটের স্বার্থে কেবল যে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করেনি তাই নয়, ভোটব্যাঙ্ক বাড়াবার জন্য নানা উপায়ে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থার পরিসর বৃদ্ধি করেছে এবং এর ফলে দলিত ও অ-দলিত জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এদের এই দুরভিসন্ধি এবং প্রতারণামূলক আচরণ আজ আর কারও অজানা নয়। ফলে সেই বুর্জোয়া শাসকরাই যখন আজ এই সংরক্ষণের উপঢৌকন নিয়ে সামনে হাজির হয়েছে, তখন নারী সমাজকে এই প্রস্তাবিত পদক্ষেপটির সর্বনাশা পরিণাম সম্পর্কে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

এ ব্যাপারে আর একটা বিষয়ও তাদের মনে রাখা উচিত। পুরুষ ও নারীসমাজের মধ্যে দ্বন্দ্বের চরিত্র, আর বর্তমানে প্রচলিত তথাকথিত উচ্চবর্ণের ও নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বের চরিত্র এক নয়। উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদের নির্বাচনে প্রার্থী করার ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বের কোন প্রতিফলনই দেখতে পাওয়া যায়না। এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে দেখা গেছে নারী-পুরুষের বাছবিচার ছাড়াই পুরুষ ভোটারদের সমর্থনে একজন উপযুক্ত মহিলা প্রার্থী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে এসেছেন।

আসন সংরক্ষণের প্রশ্নে এই সমস্ত দিক নারীসমাজকে বিবেচনা করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে, শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের সহযোগীদের স্বার্থে ও নির্দেশে পুরুষ ও মহিলা

আটের পাতায় দেখুন

ভারত সরকার

ইরাকে গণতন্ত্র রপ্তানির ঠিকাদারি নিচ্ছে

হাজারে হাজারে ইরাকি জনগণকে হত্যা এবং বিপুল ধ্বংসকাণ্ডের পরিণতিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দখলদারি কায়েম করেছে ইরাকের বুকে। অন্যদিকে ইরাকি স্বাধীনতা সংগ্রামী গোষ্ঠীগুলি প্রাণ বাজি রেখে লড়ে চলেছে স্বাধীনতার যুদ্ধ। সংগ্রামীদের মুহুর্মুহু আক্রমণে আমেরিকা দিশেহারা। সাম্রাজ্যবাদীদের ভাড়াটে সেনারা দলে দলে মরছে, বাকিরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। সারা বিশ্ব জুড়ে এমনকী খোদ আমেরিকার বুকেও ধিক্কার ও ঘৃণা বর্ষিত হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

মার্কিন শাসকরা এক পুতুল সরকারকে বসিয়েছে ইরাকের মসনদে। মার্কিন ভাড়াটে সেনাবাহিনীর কোলে বসে অস্তিত্ব রক্ষা করছে সেই সরকার। মার্কিন মদত ছাড়া এই সরকার এক মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকতে পারে না। এখন ইরাকি জনগণকে ধোঁকা দিতে 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন' মারফত 'গণতান্ত্রিক' সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর কথা বলছে আমেরিকা, রাষ্ট্রসংঘের মারফত। সেই নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে মার্কিন সেনাবাহিনীর কোলে বসে। এবং 'নির্বাচিত' সরকারকে রক্ষাও করে চলবে এই সেনাবাহিনী। এখানে মার্কিন মতলব হল, ইরাকি জনগণকে বোঝানো যে, তোমাদেরই নির্বাচিত সরকার তোমাদের শাসন করবে, অতএব তোমরা জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সরে এসো। এইভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারলে ইরাকি স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা প্রতিরোধ সংগ্রাম দুর্বল হবে, ধ্বংস হবে; অন্যদিকে মার্কিন সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে নির্বাচিত সরকার কার্যত হবে মার্কিন স্বার্থরক্ষাকারী পুতুল। এখন সেই নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে। নির্বাচনের সম্ভাব্য কাল ২০০৫ সালের জানুয়ারি।

এই প্রতারণাময় নির্বাচনে সহায়তা দিতে ইতিমধ্যেই রাজি হয়েছে কেন্দ্রের কংগ্রেস জোট সরকার। এ ব্যাপারে ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে 'মউ' স্বাক্ষরিত হয়েছে গত ২৮ আগস্ট। এই চুক্তি অনুসারে ইরাক এবং আফগানিস্তান, হাইতি, পূর্ব টিমোর, নাইজেরিয়া, কসোভো, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশে 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন' অনুষ্ঠিত হতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবে ভারত সরকারের নির্বাচন কমিশন, তাদের কর্মী, অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে (দি টেলিগ্রাফ,২৯-৮-০৪)। অর্থাৎ যে দেশগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মার্কিন হামলার শিকার এবং যেখানকার সাধারণ মানুষ মার্কিন দখলদারি কিংবা লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, সেই দেশগুলিতেই নির্বাচনী প্রহসনের ধাপ্পা দিতে চলেছে আমেরিকা রাষ্ট্রসংঘের বকলমে। যখন বিভিন্ন দেশ জনমতের চাপে ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিচ্ছে তখন ভারত সরকারের নির্লজ্জের মত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তা দেওয়ার চুক্তি বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর।

ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এস কৃষ্ণমূর্তি এই চুক্তিকে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, ''ভারতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়া রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি পেয়েছে। আমাদের দেশে নির্বাচন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রসংঘের আস্থা থাকার জন্যই এই বিশেষ দায়িত্ব আমরা পেলাম।'' (সংবাদ প্রতিদিন, ২৯-৮-০৪)। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের এই বিবৃতি থেকে মনে হবে যেন আমাদের দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া কলুষমুক্ত ও অনুসরণযোগ্য, এবং সেজন্য নির্বাচন কমিশনও বেশ গর্বিত। আসলে এইসব বিবৃতি দিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ভারতের 'গণতান্ত্রিক নির্বাচনে'র দুর্গন্ধময় কঙ্কালসার চেহারাটাকে ঢাকতে চাইছেন। এই 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার দৌলতে এদেশে বহু খুন ধর্ষণ ডাকাতি লুঠ ও অপহরণের আসামী, কোটি কোটি টাকার সরকারি তহবিল তছরূপকারী এবং মাফিয়ারা ভোটে দাঁড়াচ্ছে, জিতছে, এমনকী মন্ত্রী পর্যন্ত হচ্ছে। টাকার জোর, পেশী শক্তি, প্রচারমাধ্যমের প্রচার এবং প্রশাসনিক কারচুপি — এগুলিই এদেশে 'গণতন্ত্রে'র ভাগ্য নির্ধারণ করে। এ শুধু আমাদের কথা নয়, পূর্বতন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার লিংডো তাঁর অবসর গ্রহণের পর নিজেই একথা স্বীকার করেছেন। সেই গণতন্ত্রের বড়াই করছেন বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দেশে দেশে এ হেন 'গণতন্ত্র' পাচারের চুক্তি করেছে ভারত সরকার। দেশে দেশে যে জনগণ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ত ঢালছে, প্রাণ দিচ্ছে, লড়ছে, তাদের প্রতি এই আচরণ চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

ইরাক প্রশ্নে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পূর্বতন বিজেপি-তৃণমূল জোট সরকার প্রকাশ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রবল বিক্ষোভের চাপে তা কোন কার্যকরী রূপ নিতে পারেনি। সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস সরকারও সেই ঘনিষ্ঠতায় আরও কয়েক কদম এগিয়ে গিয়েছে, কিন্তু নানা বাগাড়ম্বরের সাহায্যে সেটাকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। গত জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা স্থাপিত ইরাকি সরকারকে মুম্বাইতে কনসুলেট খুলতে দিয়েছে কংগ্রেস সরকার। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে ১০ জুলাই এর তীব্র নিন্দা করে বলা হয়েছে, ''এ হল .....মার্কিন তাঁবেদার ইরাকি সরকারকে কার্যত স্বীকৃতি দেওয়ার এক ধূর্ত কৌশলমাত্র। এর দ্বারা পরিষ্কার যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার যে নীতি কেন্দ্রের পূর্বতন বিজেপি জোট সরকার নিয়ে চলছিল, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারও সেই একই পথে চলছে।'' এবং বেদনার হলেও সত্য যে, সিপিএম নেতৃত্ব এ বিষয়ে আশ্চর্যজনক নীরবতার দ্বারা কার্যত কংগ্রেস সরকারের মার্কিন ঘেঁষা নীতিকেই সমর্থন জোগালো; যদিও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী জনগণের কথা মাথায় রেখে তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মিছিল মিটিং করতে হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারত সরকারের মার্কিন ঘেঁষা নীতি ইরাকের দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের ভারতবর্ষের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করে তুলছে এবং এর ফল হিসেবেই মার্কিন দখলদার বাহিনীর জন্য পরিবহনের কাজে নিযুক্ত ৩ ভারতীয়কে ইরাকে অপহরণের ঘটনা ঘটেছিল।

অতীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল, তখন ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণী জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শিবির — দু'পক্ষের সঙ্গে দর-কষাকষির মধ্য দিয়ে সুবিধা আদায় ছিল তখন ভারতের শাসকদের মূল লক্ষ্য। তখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি হিসাবে আরব দুনিয়ায় ভারতবর্ষের ভাবমূর্তিও গড়ে ওঠে। এই ভাবমূর্তির আড়ালে ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী আরব দুনিয়ার দেশগুলিতে নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা আদায় করেছিল। আবার সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিজনিত কারণে যে নতুন বিশ্বপরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। ভারতের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী এবার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলে প্রতিবেশী দেশগুলিতে আধিপত্য বিস্তার এবং অন্যান্য দেশগুলিতে ভাগাভাগি করে লুণ্ঠনের পদ্ধতি নিয়েছে। তার ফলে, ভারত সরকারের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আগের মুখোসটি খসে পড়েছে। নেপাল, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার জনগণের মধ্যে ভারত রাষ্ট্র বিরোধী মানসিকতা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। ইরাকের স্বাধীনতা সংগ্রামী জনগণের মধ্যেও এই ক্ষোভ বাড়ছে; তারা অভিযোগ করছে, ভারতবর্ষ তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভাবমূর্তি থেকে সরে আসছে। অন্যদিকে ভারত সরকারের ভূমিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খুশি; মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, ''ভারতের সঙ্গে দ্রুত ও সংহত সম্পর্ক গড়ে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ''; ''আমি এবার নির্বাচনে জিতলে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং উপমহাদেশের নিরাপত্তা বিশেষ অগ্রাধিকার পাবে।'' (টাইমস অফ ইন্ডিয়া ২-৯-০৪)

আসলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী হাত ধরাধরি করে লুণ্ঠনে নেমেছে। তাই দু-দেশের শাসকদের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ভারতবর্ষের জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা এবং এদেশের, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার জনগণের সংগ্রামী বামপন্থী চেতনা এই পরিস্থিতিতে নীরব থাকতে পারে না; প্রাণ দিয়ে রক্ত ঢেলে যে ইরাকি জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপৃত তাদের সেই সংগ্রামের পাশে তাকে সকল সহানুভূতি নিয়ে দাঁড়াতে এবং ভারত সরকারের মার্কিন ঘেঁষা কার্যকলাপের প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে।

বুশ যুদ্ধাপরাধী

একের পাতার পর

পেন্টাগনের বড়কর্তাদের বিরুদ্ধে ১৯ দফার একটি অভিযোগপত্র পেশ করেন। আবেগমথিত কণ্ঠে অভিযোগপত্রটি পাঠ করেন আই এ সি'র তিনজন কর্মী।

আমেরিকা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ছোট্ট একটি দেশ, আমেরিকার ওপর আক্রমণ করা দূরে থাক, আমেরিকার বিরুদ্ধে সামান্য হুমকিও যার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়নি, সেই ইরাকের ওপর মার্কিন সেনাবাহিনী কী নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে তা সকলেরই জানা। প্রতিটি মানুষই জানেন, মার্কিন সেনারা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে কীভাবে ইরাকের শহর, নগর, বাজার এমনকী মসজিদগুলি পর্যন্ত ধ্বংস করেছে। 'ফক্স-নিউজ' এর মতো সংবাদমাধ্যম, যুদ্ধের সমর্থক হিসাবে যার পরিচিতি আছে, তাকে পর্যন্ত দেখাতে হয়েছে, মার্কিন ট্যাঙ্ক ও বিমানবাহিনী কীভাবে ইরাকের জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে নিরীহ ইরাকিদের নির্বিচারে হত্যা করেছে।

বুশ ও তার সহযোগীদের কার্যকলাপ কেন এত ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়, নিউইয়র্ক ট্রাইব্যুনালের অভিযোগপত্রে তা সুস্পষ্টরূপে দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সংঘটিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গ্রহণ করা সংজ্ঞা অনুযায়ী বুশ ও তার সহযোগীরা শান্তি ও মানবতা ধ্বংসকারী যুদ্ধাপরাধী।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধাপরাধী বুশ ও তার সহযোগীদের অভিযুক্ত করে যেসব ট্রাইব্যুনাল বসানো হয়েছে, নিউইয়র্কের ট্রাইব্যুনালে সেগুলির রিপোর্টও পেশ করা হয়। ট্রাইব্যুনালের এক সংগঠক জানান, আগামী ২০০৫ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে চূড়ান্ত ট্রাইব্যুনাল অনুষ্ঠিত হবে এবং মার্কিন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পর্ব সমাপ্ত হবে।

ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাতা হানা আল-বায়াতি ইরাকি প্রতিরোধ সংগ্রাম খুব কাছ থেকে দেখেছেন। মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে ইরাকের নজাফ, ফালুজা, সাদার ইত্যাদি শহরে যে প্রতিরোধ সংগ্রাম

নিউ ইয়র্কের ট্রাইব্যুনালে বক্তব্য রাখছেন কমরেড মানিক মুখার্জী

চলেছে তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইরাকের মানুষ নিজের দেশের সম্পদ রক্ষার জন্য যে লড়াই চালাচ্ছে, আমাদের সকলের সেই প্রতিরোধ সংগ্রামকে সমর্থন করা উচিত। দেশরক্ষার এই যুদ্ধে যেভাবে বামপন্থীরা, বিভিন্ন ধর্মীয় দল এবং বাথ পার্টির মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নিয়েছে, তিনি তারও উল্লেখ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী খাদৌরী আল-কায়েমী নামে এক ইরাকি, বসরায় তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে কী অসহনীয় আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তার বর্ণনা দেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত ইরাকি ইঞ্জিনিয়ার বলেন, ১ লক্ষের মতো ইরাকি মানুষকে আবু গ্রাইবের মতো কুখ্যাত কারাগারে পচতে হচ্ছে। তিনি বলেন, আজকের অবস্থা সাদ্দাম হুসেনের সময়ের থেকে প্রতিটি দিক দিয়ে খারাপ।

২০০৩-এর মার্চ-এপ্রিল মাসে মার্কিন বোমাবর্ষণে আহত হয়ে যেসব ইরাকি নাগরিক বাগদাদ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, তাঁদের অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মারিয়া রোজা পিয়াতরোয়া নামে স্পেনের এক ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এক লরি ড্রাইভার বর্ণনা দিয়েছেন মার্কিন বাহিনী কীভাবে ফালুজার প্রধান হাসপাতাল, জল এবং বিদ্যুতের সরবরাহ ধ্বংস করে দিয়েছিল; কীভাবে একটি অ্যাম্বুলেন্সে গুলি চালিয়ে তারা এক গর্ভবতী মহিলার অকালপ্রসব ঘটিয়েছিল।

রাষ্ট্রসংঘের 'তেলের জন্য খাদ্য' কার্যক্রমের প্রধান ছিলেন ডেনিস হ্যালিডে। সম্প্রতি ইনি পদত্যাগ করেছেন। নিউইয়র্ক ট্রাইব্যুনালে একটি 'ভিডিও' সাক্ষাৎকারে তিনি ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন অবরোধকে 'গণহত্যা' বলে অভিহিত করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন ডেনিস ব্রুটাস। তিনি বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইরাকে একটি পুতুল সরকার বসিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে যে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া আমাদের ন্যায্য অধিকার। তিনি বলেন, ইরাকের সার্বভৌমত্ব প্রকৃত সার্বভৌমত্ব নয়। ওয়াশিংটনকে ব্রুটাস চিহ্নিত করেছেন, বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদ

ছয়ের পাতায় দেখুন

জেলায় জেলায় যুব সম্মেলন

দক্ষিণ দিনাজপুর

সমস্ত কর্মক্ষম বেকারদের কাজ অথবা বেকারভাতার দাবিতে, স্বনিযুক্তি-স্বরোজগার প্রকল্পের প্রতারণা ও মদের ঢালাও লাইসেন্সের প্রতিবাদে এবং অপসংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে গত ২৫ আগস্ট এ আই ডি ওয়াই ও-র ১ম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা যুব সম্মেলন বালুরঘাট হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে গত ২২ আগস্ট বালুরঘাট টাউন ক্লাব মাঠে আট দলের একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শুরুতে রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপক ব্যানার্জী পতাকা উত্তোলন করেন এবং শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড নন্দা সাহা।

সম্মেলনের প্রকাশ্য সভা পরিচালনা করেন বালুরঘাটের বিশিষ্ট নাগরিক ডাঃ সুদীপ্ত তরফদার। বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই-এর জেলা সম্পাদক কমরেড সাগর মোদক। পরে প্রতিনিধি সভায় সকল বেকারের কাজের দাবিতে ও মদের ঢালাও লাইসেন্সের প্রতিবাদে মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড ধনঞ্জয় বর্মন। জেলার প্রধান সড়ক উন্নয়ন ও ট্রেন চালুর দাবিতে, নারী ও শিশু পাচারের প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড বীরেন মহন্ত। দুটি প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমরেড নন্দা সাহা।

সভানেত্রী কমরেড নন্দা সাহা, সম্পাদক কমরেড বীরেন মহন্ত, কোষাধ্যক্ষ কমরেড ইদ্রিশ আলি সহ ১৪ জনের একটি জেলা কমিটি ঘোষিত হয়। শেষে ফুটবল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণের পর কমরেড দীপক ব্যানার্জী বক্তব্য রাখেন।

হুগলি

বেকারি, অপসংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে এ আই ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে গত ২২ আগস্ট সিঙ্গুর মিশন স্কুলে অনুষ্ঠিত হল হুগলি জেলা যুব কনভেনশন। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক দিলীপ বাগ। এই কনভেনশনের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড পর্ণা রায়। মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমরেড অনাদি বিশ্বাস। হুগলি জেলার বিভিন্ন বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানা অবিলম্বে চালু করার ও আলু চাষীদের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার দাবিতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড সমীর দাস। এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমরেড সুশান্ত পাল।

কনভেনশনের মূল উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে আগামী দিনের আন্দোলনে ডি ওয়াই ও-র পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় একাধিক ক্লাবের সদস্যবৃন্দ।

পরিশেষে কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন এ আই ডি ওয়াই ও-র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপক ব্যানার্জী। তিনি বলেন, আজ জনজীবন তথা যুবজীবনের উপরে যে সর্বাত্মক আক্রমণ নেমে আসছে, তাকে মোকাবিলা করার একমাত্র রাস্তা উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আধারে সঠিক নেতৃত্বের পরিচালনায় দীর্ঘস্থায়ী যুব আন্দোলন গড়ে তোলা। এই আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এদেশের একমাত্র বিপ্লবী যুবসংগঠন ডি ওয়াই ও-কে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। পরিশেষে চৈতালী ভট্টাচার্যকে আহ্বায়ক করে কুড়ি জন সদস্যের একটি জেলা কমিটি গঠিত হয়।

হাওড়া

ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে হাওড়া জেলা যুব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ২৯ আগস্ট বাগনান উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন কমরেড কার্তিক শীল। প্রধান অতিথি ছিলেন হাওড়া জেলার এস ইউ সি আই-এর বিশিষ্ট নেতা কমরেড অরূপ রতন সাহা। প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড দীপক ব্যানার্জী। শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে কনভেনশনের কাজ শুরু হয়। প্রধান বক্তা বলেন, তীব্র বেকারি, স্বনিযুক্তির ভাঁওতাবাজী, মদের ঢালাও লাইসেন্স, অপসংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা সমাজকে সব দিক থেকে গ্রাস করছে। এদেশের পুঁজিপতিশ্রেণী অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের মাধ্যমে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলছে। আজ গুদামে খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী মজুত, কিন্তু সাধারণ মানুষ বাঁচার জন্য তার এক কণাও হাতে পায় না। এই পরিস্থিতি বদলের জন্য জঙ্গি যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সবশেষে কমরেড প্রদীপ মণ্ডলকে সভাপতি ও কমরেড নিখিল রঞ্জন বেরাকে সম্পাদক করে ৩০ জন সদস্যের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

উত্তর দিনাজপুর

জেলায় শিল্প স্থাপন এবং খুন-ইভটিজিং-নারীপাচার বন্ধের দাবিতে উত্তর দিনাজপুর জেলা যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ২৬ আগস্ট। ঐদিন রায়গঞ্জ শিলিগুড়ি মোড় থেকে দুই শতাধিক যুবক-যুবতীর সুসজ্জিত মিছিল রায়গঞ্জ শহর পরিক্রমা করে মোহনবাটী রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে প্রকাশ্য সমাবেশে পৌঁছায়। প্রকাশ্য সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কমরেড রঞ্জন সরকার। বক্তব্য রাখেন এ আই ডি ওয়াই ও-র উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড বিপ্লব কর্মকার, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই-এর উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড শ্যামল দে। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এ আই ডি ওয়াই ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপক ব্যানার্জী। প্রত্যেক বক্তাই যুবজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এরপর প্রতিনিধি সম্মেলনে কমরেড গোপাল ঘোষকে সভাপতি ও কমরেড বিপ্লব কর্মকারকে সম্পাদক করে ১৫ জনের উত্তর দিনাজপুর জেলা ডি ওয়াই ও কমিটি গঠিত হয়।

বুশ যুদ্ধাপরাধী

পাঁচের পাতার পর

চালানোর প্রধান কারিগর হিসাবে।

অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে মানিক মুখার্জী বলেন, যতদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, ততদিন যুদ্ধও থাকবে। বস্তুত, পৃথিবীতে আজ এমন কোনও দেশ নেই যেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার থাবা বিস্তার করেনি। ফলে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা আজ জরুরি। এজন্য বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াকু শক্তিগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা দরকার। ভারতবর্ষে অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট ফোরামের উদ্যোগে যেসব বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়েছে, ভিডিওতে তার ছবি দেখানো হয়।

এ এফ এস এম সি ই জেলা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ব্রেন্ডা স্টোকলে তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণে, আগামী ১৭ অক্টোবর ওয়াশিংটনে যে বিশাল শ্রমিক মিছিল হবে, তাতে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের যোগ দেবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এর ফলে প্রকৃত শত্রুর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা সহজ হবে।

নিউইয়র্কে এই ট্রাইব্যুনাল যখন চলছে তখন শহর ছেয়ে ছিল হাজার হাজার পুলিশে। 'রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশন'-এর বিরুদ্ধে বিশাল বিক্ষোভের আয়োজনকে ঠেকাতেই পুলিশের এই ব্যাপক ব্যবস্থা। নিউইয়র্ক ট্রাইব্যুনালে অংশগ্রহণকারীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে পুলিশের তল্লাশির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

আই এ সি'র প্রতিষ্ঠাতা র‍্যামসে ক্লার্ক পরিশেষে দর্শকদের কাছে প্রশ্ন রাখেন — "একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে মার্কিন সরকার সামরিক খাতে অন্য সমস্ত বিষয়ের চেয়ে বেশি অর্থ খরচ করে। সারা বিশ্বের পক্ষে এ অতি ভয়ানক বিষয়। ইরাকের ওপর মার্কিন সরকার যে আঘাত হেনেছে,

নিউ ইয়র্কে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল চলাকালীন আলোচনা করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্ক এবং কমরেড মানিক মুখার্জী

তা আগ্রাসী যুদ্ধ ছাড়া কিছুই নয়। ন্যুরেমবার্গ বিচারে এই অপরাধকে 'চরম অপরাধ' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এরা কি জনগণের ভোট পাওয়ার যোগ্য?"

স্বভাবতই উত্তর ছিল অত্যন্ত জোরালো ও স্পষ্ট — না ; বুশ বা কেরি কেউই জনগণের ভোট পেতে পারে না।

(নিউইয়র্ক থেকে পাঠানো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টারের রিপোর্ট থেকে)

আগরতলায় বিশাল ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল

পশ্চিমবাংলার মতো ত্রিপুরা রাজ্যেও সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার গরিব ও সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০২ সাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও সরকারি অনুদান প্রাপ্ত স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত নোডাল ব্যবস্থা চালু হয়েছে। প্রতিটি ব্লক, নগর পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটিতে একটি করে নোডাল স্কুল চালু করা হয়েছে। নোডাল স্কুলগুলি অধীনস্থ স্কুলগুলির পরীক্ষা পরিচালনা করে। তাদের দ্বারা প্রকাশিত প্রশ্ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ১০০ শতাংশ মিলে যায়। ফলে ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তক না পড়ে সাজেশন পড়ে ভাল নম্বর পেয়ে পাশও করে যায়। কিন্তু সেই বিষয়ে কোন জ্ঞান গড়ে ওঠে না। এর ফলে শিক্ষার বুনিয়াদ ও মান বিনষ্ট হচ্ছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় নোডাল না থাকায় বহু ছাত্রছাত্রী ফেল করছে। অথচ বেসরকারি স্কুলগুলিতে এই নোডাল পদ্ধতি না থাকায়, পড়াশোনার মান এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার ছাত্রছাত্রীরা বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে।

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির ত্রিপুরা রাজ্য শাখা প্রথম থেকেই এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। আন্দোলনের চাপে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ২০০৫ সাল থেকে নবম ও দশম শ্রেণী থেকে নোডাল পদ্ধতি উঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোডাল ব্যবস্থা বহাল রাখছে। তাছাড়া ২০০৫ সাল থেকে সমস্ত ক্লাসে বার্ষিক ফি কয়েকগুণ বাড়ানো এবং নবম শ্রেণী থেকে টিউশন ফি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২৭ আগস্ট ছাত্র-যুবক-অভিভাবকদের এক বিশাল মিছিল আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জয়নগর বাসস্ট্যান্ডের সভাতে মিলিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সেভ এডুকেশন কমিটির আহ্বায়ক অরুণ ভৌমিক। এই সভা থেকে সুব্রত চক্রবর্তী, মলিন দেববর্মা, অজিত দাস, বিভুলাল দে, শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ১৫০০০ স্বাক্ষরসহ স্মারকলিপি পেশ করেন।

ওড়িশায় মহিলাদের বিধানসভা অভিযান

প্রস্তাবিত ওড়িশাসুন্দরী প্রতিযোগিতা, ঢালাও মদের লাইসেন্স, ধর্ষণ, নারীপাচার, অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে গত ৩১ আগস্ট মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ওড়িশা রাজ্য কমিটির ডাকে হাজার হাজার মহিলা ভুবনেশ্বরে মিছিল করে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করতে যান। সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকী রাজ্য পুলিশের মতেও এত বৃহৎ মহিলা মিছিল ভুবনেশ্বরে ইতিপূর্বে হয়নি। বিধানসভার কাছে পুলিশ পথ আটকালে মহিলারা সেখানে অবস্থান করে এক সমাবেশ করেন। এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী ও সহসভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরী। সুন্দরী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কীভাবে নারীদেহের যৌনতার প্রদর্শনী করা হচ্ছে, মদের প্রসার কীভাবে পরিবারের মহিলাদের জীবনে অশেষ দুর্ভোগ ডেকে আনছে এবং গোটা দেশে আজ কীভাবে নারীদেহকে বাজারের পণ্য করে তোলা হচ্ছে, তার ওপর কমরেড ছায়া মুখার্জী আলোচনা করেন। এছাড়াও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভানেত্রী কমরেডস্ বীণাপাণি দাস, রাজ্য সম্পাদিকা স্বয়ংপ্রভা নায়েক এবং বিভিন্ন জেলার নেত্রীবৃন্দ। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কোনও ক্যাবিনেট স্তরের মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু পুলিশ এই নিয়ে টালবাহানা করতে থাকায় মহিলারা প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়েন। কমরেড বীণাপাণি দাস ঘোষণা করেন, ১০ মিনিটের মধ্যে কোনও মন্ত্রী দেখা করতে রাজি না হলে বিক্ষোভকারীরা পুলিশ কর্ডন ভেঙে বিধানসভার অভ্যন্তরে ঢুকে যাবেন। এই নিয়ে মহিলাদের সঙ্গে পুলিশের বাকবিতণ্ডা চলে। হাজার হাজার ক্ষিপ্ত মহিলাদের সামলাতে পুলিশ হিমসিম খেয়ে যায়। অতঃপর পুলিশ অফিসার ঘোষণা করেন, ক্যাবিনেট মন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোড়ই স্মারকলিপি গ্রহণ করবেন। মহিলারা জানেন সুকিন্দার বিশিষ্ট শ্রমিক সংগঠক কমরেড শ্যামাপদ রাউতকে গুম করে হত্যা করিয়েছিল এই প্রফুল্ল ঘোড়ই। তাই তার কাছে স্মারকলিপি পেশ করার প্রস্তাব মহিলারা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেন। পরে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে নেত্রীবৃন্দ ঘোষণা করেন, সরকার দাবিগুলির প্রতি কর্ণপাত না করলে রাজ্যব্যাপী তীব্র আন্দোলন হবে।

প্রবীণ পার্টি সদস্যের জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলায় এস ইউ সি আই-এর নিতুরিয়া আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড চন্দ্রদীপ প্রসাদ যাদব গত ১৫ আগস্ট হৃদরোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়ে বিকাল ৪টায় ই সি এল-এর শাকতোড়িয়া হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

৬০ এর দশকের শেষদিকে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এস ইউ সি আই দলের সাথে যুক্ত হন। কর্মজীবনে প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে তিনি বহু শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর পরিচালনায় কোলিয়ারি অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের নেতৃত্বে শত শত ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত কোল মাইনার্স ইউনিয়ন গঠনে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এলাকার বহু গণআন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

কোলিয়ারি অঞ্চলের সহস্রাধিক মানুষ তাঁর শেষযাত্রায় অংশ নেন। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অন্যতম সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড সুনীল মুখার্জী তাঁর মৃত্যুসংবাদে গভীর শোক প্রকাশ করেন। গত ২৮ আগস্ট পারবেলিয়ায় বি পি টি এ-র আহ্বানে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বি পি টি এ-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড কার্তিক সাহা প্রয়াত কমরেডের চরিত্রের সংগ্রামী দিক তুলে ধরে বলেন, যে শিক্ষা এবং শিক্ষক আন্দোলন তথা গণআন্দোলন তিনি গড়ে তুলেছিলেন সেই আন্দোলনকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার মধ্য দিয়েই তাঁকে যথার্থভাবে স্মরণ করা হবে।

কমরেড চন্দ্রদীপ প্রসাদ যাদব লাল সেলাম

মিথ্যাবাদী টনি ব্লেয়ার

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্রিটেনের বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম বিবিসি'র প্রধান সম্পাদক গ্রেগ ডাইক বেশ কয়েকমাস আগে বিবিসি থেকে পদত্যাগ করেন। ইরাক যুদ্ধে ব্রিটেনের লেবার পার্টি সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে বিবিসি প্রচারিত একটি প্রতিবেদন ঘিরে প্রবল আলোড়ন ওঠে, যার জেরে ডাইককে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এ সম্পর্কে সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের জবাব সেসময় ডাইক দেননি, বলেছিলেন যথাসময়ে তিনি সব জানাবেন। সম্প্রতি গ্রেগ ডাইক তাঁর আত্মজীবনী 'ইনসাইড স্টোরি'তে সকল কথা খুলে জানিয়ে দিয়ে বলেছেন, তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেননি, তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল ; ব্লেয়ার সরকারের চাপের কাছে বিবিসি'র কর্তৃপক্ষ ভীরু কাপুরুষের মতো নতিস্বীকার করেছিল।

জর্জ বুশের সাথী হয়ে টনি ব্লেয়ার ইরাক আক্রমণে যাবেন, একথা ঘোষণার পরই ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো ব্রিটেনেও গণপ্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ব্লেয়ার প্রশ্নের সম্মুখীন হন। এ সময় ইরাক আক্রমণের সমর্থনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্য ব্লেয়ার হাউস অফ কমন্‌সে ইনিয়ে বিনিয়ে বক্তৃতা করে বোঝান যে, ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের তথ্য বলছে, সাদ্দাম হুসেনের হাতে এমন মারাত্মক গণমারণাস্ত্র আছে যা ব্যবহার করে সাদ্দাম ৪৫ মিনিটের মধ্যে বিশ্বকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। আর বিশ্ব ধ্বংস হলে ব্রিটেনও বাঁচবে না, অতএব সাদ্দামকে খতম করার জন্য ইরাকে আক্রমণ চালানো ব্রিটিশ সরকারের 'মহান কর্তব্য'। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের আদর্শ বলে কথিত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য হৈ হৈ করে ব্লেয়ারের সমর্থনে হাত তুলে দেন। ব্রিটেনের রাস্তায় রাস্তায় তখন লাখো জনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার। অথচ সেই জনগণের প্রতিনিধি বলে দাবিদার পার্লামেন্ট সদস্যরা সিদ্ধান্ত করেন, একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ইরাক, ব্রিটেনের প্রতি কোন শত্রুতামূলক আচরণ যে করেনি, তাকে ধ্বংস করার জন্য হানাদারি চালানো হবে। এই হচ্ছে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের চেহারা!

ইরাক দখল করার পর মার্কিন-ব্রিটিশ সৈন্যরা মাটি খুঁড়েও যখন কোনও গণমারণাস্ত্রের সন্ধান পেলনা, তখন আমেরিকার মত ব্রিটেনেও প্রশ্ন উঠে গেল, ব্লেয়ার কোন্ প্রমাণের ভিত্তিতে ৪৫ মিনিটে পৃথিবী ধ্বংসের কথা শুনিয়েছিলেন? এই রহস্যের অনুসন্ধান চালিয়েই বিবিসি একটি প্রতিবেদনে জানায় যে, সরকারি দপ্তরের ভিতরকার খবর থেকেই তারা জেনেছে যে, গোয়েন্দা রিপোর্টে কারচুপি করা হয়েছিল এবং সেটা ব্লেয়ারের মিডিয়া উপদেষ্টা ক্যাম্পবেলের নির্দেশ ও পরিকল্পনা মতই ; যার অর্থ টনি ব্লেয়ার স্বয়ং এটা করিয়েছিলেন। বিবিসি'র এই সংবাদে সরকারি মহলে আলোড়ন পড়ে যায় এবং গোয়েন্দা দপ্তরের কোন্ ব্যক্তি এই সংবাদ বিবিসিকে দিয়েছে, তা জানার জন্য চাপ সৃষ্টি হয়। এরপর হঠাৎ একদিন গোয়েন্দা দপ্তরের বিজ্ঞানী মিঃ কেলি'র মৃতদেহ তার নিজের বাড়ির অদূরে আবিষ্কৃত হল। জানা গেল যে, তিনিই বিবিসির গোপন সংবাদের 'সোর্স' এটা সরকার জানতে পেরে তার উপর এমন তীব্র মানসিক চাপ সৃষ্টি করে যে, তিনি তা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেন।

এই ঘটনায় ব্লেয়ারের মুখের কালি মোছার পরিবর্তে আরও গাঢ় হল। তখন ব্লেয়ার সরকার লর্ড হাটন নামে এক বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত কমিশন বসাল, কমিশন রায় দিল ইরাক যুদ্ধের দলিলে ব্লেয়ার সরকার কারচুপি করেছে বলে বিবিসি'র পরিবেশিত সংবাদ সত্য নয়, এরকম কিছু ঘটেনি। বিবিসি'র আন্তর্জাতিক সুনামে এটা বিরাট

আটের পাতায় দেখুন

প্রচন্ড দুর্যোগ উপেক্ষা করে ৩১ আগস্ট ডি এস ও-র ডাকে কলকাতায় বিশাল ছাত্রমিছিল

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরোধী দিবসে কলকাতায় মহামিছিল

৪র্থ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব সম্মেলন

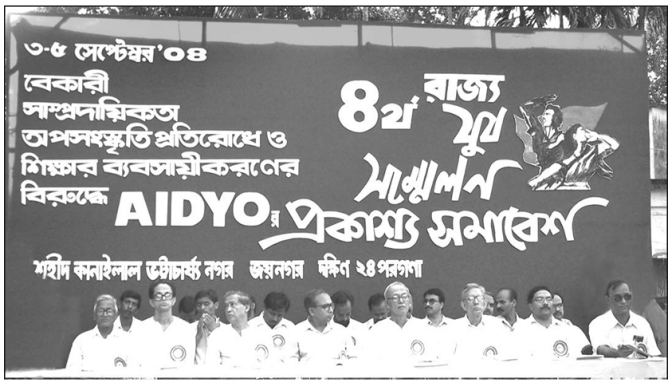

এ আই ডি ওয়াই-র ৪র্থ রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্য নগরে (জয়নগর) ৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশ্য সমাবেশ। (ওপরে) মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত যুব নেতৃবৃন্দ এবং ভ্রাতৃপ্রতিম যুব সংগঠনের প্রতিনিধিগণ। (নিচে) রক্তাখাঁ মাঠে সমবেত বিশাল সমাবেশের একাংশ।

মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ

চারের পাতার পর

সম্প্রদায়ের মধ্যে অসাম্য ও বিভেদ বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থা নিশ্চিতরূপে বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থে পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি হিসাবে প্রধানত ধনী সম্প্রদায়ের কিছু মহিলার সংসদে ঢোকার পথই প্রশস্ত করবে। কিন্তু এর দ্বারা নারীসমাজকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে যথাসম্ভব তাদের সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে অধিক সংখ্যায় নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করা এবং সেই পথে বিধানসভা ও লোকসভায় তাদের ভাল সংখ্যায় উপস্থিতি সুনিশ্চিত করার কাজটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ফলে নারীদের দুর্বল বলে গণ্য করে তাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে দয়াদাক্ষিণ্য দেখাবার মনোভাব নারীদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আত্মমর্যাদায় বলীয়ান নারীদেরও দয়াদাক্ষিণ্য দেখাবার মন থেকে উদ্ভূত এই সংরক্ষণের প্রস্তাব ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করতে হবে। নারীসমাজকে অতি অবশ্যই মনে রাখতে হবে সংগ্রামশীলতা, দক্ষতা, সচেতনতা, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন করে সমস্ত প্রশ্নে পুরুষদের সমকক্ষতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়েই যেহেতু তাঁরা নারীমুক্তি আন্দোলন পরিচালনা করছেন, সেইহেতু 'দুর্বলের জন্য সংরক্ষণ' এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত চূড়ান্ত ক্ষতিকারক এই প্রস্তাব তাঁরা মেনে নিতে পারেন না। সমাজে নিজেদের উপযুক্ত স্থান অধিকার করার জন্য নারীসমাজকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে এবং পুরুষদের সাথে একত্রে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিজেদের নিযুক্ত করতে হবে। পুরুষ সম্প্রদায়ের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরিষদীয় ও পরিষদ-বহির্ভূত উভয় সংগ্রামই গড়ে তুলতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় সমস্ত ক্ষেত্রেই পুরুষদের সাথে সমান অধিকার আদায় করে নিতে হবে।

মিথ্যাবাদী টনি ব্লেয়ার

সাতের পাতার পর

আঘাত। অতএব এর দায় নিয়ে গ্রেগ ডাইককে পদত্যাগ করতে হল।

এবার গ্রেগ ডাইক পর্দার পিছনের কাহিনী উন্মোচন করে দিয়ে বলেছেন, ব্লেয়ার সরকারের চাপের মুখে বিবিসি'র পরিচালকমণ্ডলীর ৬ জন সদস্য যেন জলে ভেজা বিড়াল হয়ে গেল এবং আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করল। এ জিনিস আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

ব্রিটেনে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার মুখোশ ছিঁড়ে দিয়ে ডাইক বলেছেন, ইরাক আক্রমণের পরই ব্লেয়ার বিবিসি'র উপর চাপ দিতে থাকেন যাতে ব্লেয়ার সরকারের মনোমত করে সংবাদ পরিবেশন করা হয়। অনুগত লর্ড হাটনকে খুঁজে বের করা হয়েছিল যাতে কমিশনের রায় সরকারের পক্ষে যায়। চাপ দিতে যেসব চিঠি ব্লেয়ার বিবিসিকে পাঠান, ডাইক সেগুলি প্রকাশ করে দিয়ে বলেছেন, ব্লেয়ারের মিডিয়া উপদেষ্টা অ্যালিস্টেয়ার ক্যাম্পবেল হচ্ছে আর এক শয়তান। সরকারের চাপের কাছে বিবিসি মাথা নোয়ায়নি বলে প্রতিহিংসায় বিবিসি'র বিরুদ্ধে কুৎসায় নেমেছিলেন ক্যাম্পবেল।

ইরাকে মারণাস্ত্র বিষয়ে সত্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর টনি ব্লেয়ার যে বলেছেন, তিনি ঐ ৪৫ মিনিটের অর্থ বুঝতে পারেননি, তাকে ডাহা মিথ্যা বলে অভিহিত করে ডাইক বলেছেন, টনি ব্লেয়ার হচ্ছে এক নম্বর মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ, আমাদের সকলকে সে ধোঁকা দিয়েছে।

এরপরও না জর্জ বুশ, না টনি ব্লেয়ার কেউই ইরাকের জনগণের কাছে ক্ষমা চাইছেন না, বরং ইরাকে দখলদারিকেই ন্যায্য বলে গলাবাজি করছেন। এর জবাব ইরাকের জনগণ অস্ত্রের ভাষায় দিচ্ছেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সাম্রাজ্যবাদীরা জনগণের এই ভাষাই একমাত্র বোঝে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net